জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ

অরুণ দাশগুপ্ত

বিরল হলেও এমন কিছু মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় যাদের সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতা জীবনের চলার পথে এক অফুরন্ত উৎসাহ-রূপ পাথেয় হিসাবে থেকে যায়। এমনি একজন মানুষ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা আমাদের সবারই প্রিয় বটুকদা।

আজ থেকে অনেকদিন আগেকারই কথা হবে, তা প্রায় ৩৫ বছর। করোলবাগ ওয়েস্টার্ন এক্সটেনশনে থাকতাম। একদিন ভোরে সমবেত সঙ্গীতের সুরেলা ধ্বনিতে জেগে দেখি রাস্তা দিয়ে প্রভাত ফেরীর একটি ছোট্ট মিছিল নববর্ষে বৈশাখের শুভাগমনের আহ্বান জানিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে। সামনের সারিতে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে যিনি সঙ্গীত পরিচালনা করছিলেন তিনি বটুকদা।

একাধারে স্বনামধন্য কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, গীতকার, সঙ্গীত-নির্দেশক বটুকদার বহুমুখী প্রতিভার ছোঁয়া। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তারাই পেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও গণসংস্কৃতির প্রতি অটুট বিশ্বাস, সাধারণের মনে প্রেরণা সঞ্চার করবার অক্লান্ত প্রয়াসের অভিব্যক্তি হিসাবে বটুকদাকে দেখতে পাই হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে প্রভাত ফেরীর প্রথম সারিতে। মুজিব অভ্যর্থনার জন্য পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে "সোনার বাংলা" গানের মহড়া নিয়ে পালাম বিমান বন্দরে দৌড়ানো অথবা নির্বাচনী প্রচারে দূরদূরান্ত গ্রামে পায়ে হেঁটে হেঁটে কৃষক সভায় গান গেয়ে শোনানো।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৭১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দিল্লী শাখা একটি তিন দিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করে। বটুকদা এবং গণনাট্য আন্দোলনের অন্য এক দিকপাল শ্রীবিনয় রায় এই আয়োজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। কার্যসূচীর মধ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্রনাথের "আফ্রিকা" কবিতাটির ছায়া নাট্যরূপ। বটুকদা ভার নিয়েছিলেন তার সঙ্গীত সৃষ্টি এবং সঙ্গীত পরিচালনার আর বিনয়দার উপর ভার পড়েছিল নির্দেশনার।

বটুকদা তখন ভারতীয় কলাকেন্দ্র প্রযোজিত রামলীলা নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত-নির্দেশক ছিলেন। তা ছাড়া নানা কাজে তিনি প্রায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তারই সঙ্গে প্রায় চার মাস ধরে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় শঙ্কর মার্কেটের আই পি টি এ-র ছাতে 'আফ্রিকা'র সঙ্গীত সৃষ্টি করতেন তিনি। বটুকদার সঙ্গীত নির্দেশনায় এবং বিনয়দার পরিচালনায় "আফ্রিকা" একটি প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

কেবলমাত্র 'আফ্রিকা'-ই নয়। বটুকদার প্রেরণায় এবং ব্যক্তিগত উৎসাহে গণনাট্য সংঘের গানের দলটি পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। নতুন গানের মহড়ায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে শঙ্কর মার্কেটে আই. পি. টি এ-র হলঘর। না, না, না, না না। মানব না, মানব না। কোটি মৃত্যুরে কিনে নেব প্রাণপথে, ভয়ের রাজ্যে থাকব না। না, না, না॥

এই লেখাটি, লেখকের ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র'র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

অথবা

এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার
এসো শিল্পী, বিশ্বকর্মা এসো স্রষ্টা, রস রূপ মন্ত্র দ্রষ্টা।
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো বন্ধনের এই অন্ধকার॥

বটুকদার রচিত এবং সুরারোপিত নবজীবনের এই গানগুলি দিল্লীর আই. পি. টি. এ-র জীবনে নতুন জোয়ার আনবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ স্থাপনার গোড়ার দিকেই বটুকদা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এ কথা বললে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যে তাঁর জীবনের অন্তিম চরণ পর্যন্ত তিনি গণনাট্য আন্দোলনের সর্বজনস্বীকৃত এবং সম্মানিত অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। আর কেবল মাত্র গানই নয়। অবশ্যই নবজীবনের গানের শৃঙ্খলায় বটুকদা যে সমস্ত গান ও তাদের সুর উপহার দিয়েছিলেন গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে তা চিরকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে। কিন্তু কবি হিসাবেও বটুকদা সমকালীন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সালটা ঠিক মনে নেই। পঞ্চাশের দশকের কথাই হবে। কলকাতার ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটের চারতলার হলঘরে শুনেছিলাম নাট্যজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শম্ভু মিত্রের মধুবংশীর গলি-র আবৃত্তি। শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে মধুবংশীর গলি-র আবৃত্তি শোনা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ফুল এবং স্ফুলিঙ্গ একই সঙ্গে ঝরে পড়ছিল শম্ভু মিত্রের কণ্ঠ থেকে। প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল কবিতার প্রতিটি ছত্র। এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি যেন প্রবেশ করছিল দেহের ভিতর প্রতিটি রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এক হল মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে নিশ্চুপ। অবশেষে যবনিকা নেবে এলো আবৃত্তির উপর। শেষ পংক্তি কটি :

তারপর অবকাশ
রাত্রি উঠে আসবে গাঢ় নীল
স্তব্ধ ডানা পৃথিবীর নীড়ে আসবে নেমে
সুস্থ কামনার স্বর্ণবিল,
প্রতিদিনের জ্বলন্ত অস্তের পর
শ্রম বিরতির পর।
তারপর সুস্থ মুক্ত প্রাণসঙ্গিনীদের নিয়ে
আবিশ্ব প্রাণ-নৃত্যের অবতারে
জমবে ভাল, জমবে তখন
মধুবংশীর গলি
বজ্রনিনাদে তোমাকেই ডেকে বলি।

বটুকদার এই কবিতাটি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যদিও এই নিবন্ধটি এই আলোচনার উপযুক্ত স্থান নয়। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যায় যে মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-নিরাশা, ভয়-ভীতি এবং সংগ্রামী চেতনা, আর তারই সাথে অপূর্ব মধুর এক রোমান্টিক মনের ছবি মধুবংশীর গলির আনাচে কানাচে যে ভাবে ছড়িয়ে আছে তা বাংলা সাহিত্যে জীবনমুখী সংগ্রামী কবিতা শ্রেণীর মধ্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই লেখাটি, জেনুয়ারী ১৯৫৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাণী নতুন সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া

মিলনসাগর
www.milansagar.com

প্রায় চার দশক ব্যাপী সৃজনশীল জীবনের অত্যন্ত অল্পকালই দিল্লীর আই. পি. টি. এ.-তে আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম বটুকদার সংস্পর্শে আসবার, তাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সামগ্রিক আন্দোলনের উপর তাঁর প্রভাব বা অবদানের আলোচনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নয়।

গণনাট্য আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বটুকদা ছিলেন অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সৃষ্ট কবিতা, গান মুখ্যত বাংলা ভাষাতে হলেও তার প্রভাব ছিল সর্বভারতব্যাপী। বটুকদার 'নবজীবনের গান'-এর শৃঙ্খলার বেশ কয়েকটি গান অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনুরূপ উদ্দীপনা সহ পরিবেশিত হয়েছে।

গণসংস্কৃতি সৃষ্টি এবং প্রসারে চিরকালই উদ্যোগী ছিলেন বটুকদা। সর্ব স্তরের মানুষের কাছাকাছি থেকেই সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন তিনি। স্বাধীনতা লাভ ও দেশবিভাগের স্বল্পকাল পরেই এক উপনির্বাচন উপলক্ষে আমরা কয়েকজন ছাত্র গিয়েছিলাম পশ্চিম দিনাজপুরে নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করতে। শুনেছিলাম আই. পি. টি. এ. থেকে একটি দল আসবে এই প্রচারে অংশগ্রহণ করতে। বটুকদা ছিলেন সেই দলে। চাক্ষুস দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে, কিন্তু তার রচিত এবং সুর দেওয়া গান :

"ভুঁড়ি ডাংরার ব্যাটাটা,
মোটর ধারী ন্যাতাটা
মোক ভুলালু ভোটের বচন দিয়ারে
ভোটের বচন দিয়া...॥

আর বিনয় রায়ের উদার কণ্ঠে গাওয়া সেই গান অনেক গ্রাম্য সমাবেশে রীতিমত সারা জাগিয়েছিল।

সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতের বাইরে বটুকদা ছিলেন একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় মানুষ। বিশেষত শিশুদের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন তাদের প্রিয় বটুক জেঠু। মাঝে মধ্যেই দেখতাম আমার পুত্র অনিরুদ্ধর পড়ার ঘরে (তখন তার বয়স হবে ৭ বছর) একদল বাচ্চাদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন বটুকদা। একদিন অনিরুদ্ধর 'আবোল তাবোল' বইয়ের উৎসর্গ পাতায় লিখলেন :

দেখতে বেজায় কচি আমাদের হোচি
পরণে রঙ্গীন জামা যেন পাঞ্চেন লামা॥

তখন হো-চি-মিন এবং পাঞ্চেন লামার নাম প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনামায় দেখা যেত। আর সেই থেকে পাড়ার ছেলেদের কাছে অনিরুদ্ধর ডাক নাম হো-চি হয়েই আছে। বটুকদার অন্যান্য সখের কথা আমার জানা নেই। তবে পাখী দেখে বেড়ানো তার একটা নেশার মতই ছিল। বটুকদা প্রায়ই বেড়িয়ে পড়তেন পাখীর খোঁজে, গাছের ডালে খুঁজে বেড়াতেন নতুন কোন পাখীর ঝাঁক। দু একবার এরকম অভিযানে বটুকদার সঙ্গে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। পক্ষীতত্ত্ব সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি দেখে অবাক হতে হয়েছে।

বটুকদা, বিনয়দা সহ আই. পি. টি. এ-তে আমরা অনেকেই ক্রমাগত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলাম যে দিল্লীর আই. পি. টি. এ-কে রাজধানীতে আর একটি বাঙালি সংস্থায় পরিণত

এই লেখাটি, নেত্রকোণার ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাপ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার নন্দ সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া

মিলনসাগর
www.milansagar.com

করবার কোন যৌক্তিকতা নেই। রাজধানীর হিন্দুস্থানী-প্রধান কসমোপলিটান চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে দিল্লীর আই. পি. টি. এ-কে তার উপযোগী করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল এই সময়তেই। বটুকদা এবং বিনয়দা এই প্রয়াসে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। নানা কারণে এই প্রয়াস আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয়নি। অল্প সময়ের জন্য হলেও দিল্লীর আই. পি. টি. এ-র সঙ্গে বটুকদার যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার লাভ সামগ্রিকভাবে আই. পি. টি. এ. এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিল্পী উপভোগ করেছেন।

নামী, দামী শিল্পী সংস্কৃতিবিদদের আমরা দূর থেকে প্রণাম করতেই অভ্যস্ত কিন্তু বটুকদা ছিলেন আপনার পায়ে চলার পথের সাথী। মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগীদার তাই বোধ হয় সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেডিকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি তিনি। মধুবংশীর গলি-র সেই দুটি ছত্র যেন বারবারই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

"টাকা, টাকা আর টাকা,
সমস্ত দিনের হীন বাণিজ্যটাই ফাঁকা।

দৈনন্দিন জীবনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের বৃহত্তম সংগ্রামের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না বটুকদার জীবনে। তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ কবিতা ও গান আই. পি. টি. এ-র আদর্শকে আরও শক্তিশালী অস্ত্রে সমৃদ্ধ করেছে।

বটুকদার জীবনের একটা বিশেষ দিক, তা সে রাস্তায় গানের মিছিলে সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে যাওয়াই হোক অথবা সংবেদনশীল সঙ্গীতে রূপ দেওয়াই হোক, জীবনযুদ্ধে আপসের পথ বেছে নেননি তিনি। সুন্দর বাণিজ্যিক পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তার শিল্পকে, প্রতিভাকে পণ্য হিসাবে বাজারে উপস্থিত করেন নি তিনি। সংগ্রামী মানুষের অন্তিম বিজয়ের প্রতি অটুট বিশ্বাস তার কবিতাগুচ্ছের ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে।

বটুকদার একটি স্বল্প পরিচিত কবিতার একটি অংশ উদ্ধৃত না করে এই ছোট্ট নিবন্ধটি শেষ করতে পারছি না। কবিতাটির নাম "সপ্তাহে সপ্তাহে"। সপ্তাহ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লেখা এই কবিতাটি তারই কয়েকটি লাইন :

মানুষকে খুঁজে ফিরি প্রতি সপ্তাহে,
বাবুদের আড্ডায়, চা-খানায়, পার্কে, মিটিং-এ
পরশ পাথর খুঁজে ফেরা সে প্রসিদ্ধ ক্ষেপা
এবার খুঁজছে হাড়,
কুকুর, মেকুর আর শকুনির হাড়,
চামচিকে, বাদুরের সোনাতলা বস্তির
বেশ্যার জণ্ডযার হাড় লাশকাটা ঘরে,
উলটে পালটে খোঁজে, ডাস্টবিন ঘাঁটে,
কোথাও নেই সে হাড়।
যে হাড় খণ্ড খণ্ড জুড়ে মেরুদণ্ড হয়—
দধিচীর মেরুদণ্ড—,
যার শীর্ষে বসা সে সত্যসন্ধ মাথা

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া

মিলনসাগর
www.milansagar.com

বিশ্বাসে অটল, সততায় আমরণ পণ–
অ্যাঙ্গোলার ভাড়াটে গুণ্ডার মত, কিনতে পারে না যাকে
ডলার বেশ্যারা।
কোথায় সে হাড়, মেরুদণ্ড আর দৃপ্ত মানুষেরা?
অনেক প্রত্যাশা, স্মৃতি নিয়ে খুঁজি সপ্তাহে সপ্তাহে
শ্রদ্ধেয় নফর কুণ্ডু, আপনাকে সবিনয়ে বলি—
এই তো সে দিন দেখা আপনার সঙ্গে রাস্তার মোড়ে।
আপনার আশ্বাস বাণী মনের একটা কোনে
প্রতিধ্বনি তোলে— আছে, আছে, আছে।
মানুষকে বাঁচাবার মত সব মানুষেরা আছে,
এ-ধারে ও-ধারে যত হত্যাকারী গুণ্ডাদের ভীড়ে।
আলোর স্ফুলিঙ্গ হয়ে অন্ধকারে জ্বলে জ্বলে ওঠে।
এই সব স্ফুলিঙ্গগুলি একত্রিত হয়ে একদিন
হঠাৎ উঠবে জ্বলে প্রচণ্ড দেশ জোড়া মশালের মত—
আগ্নেয় সে বিস্ফোরণে নূতন সূর্য্যের মত দিন।
সে আলোয় দেখতে পাবো আপনাকেও
আরও সব মেরুদণ্ডী মানুষদের উজ্জ্বল মুখ।
এই আশায় আমি বেঁচে যাবো, ভেসে যাবো সপ্তাহে সপ্তাহে,
অনাগত ভবিষ্যের উজ্জ্বল প্রাণের প্রবাহে॥

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।